বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২৬

ই-ম্যাগাজিন

স্বাধীনতা, চিন্তায়–চেতনায়

"স্বাধীনতা শুধু ইতিহাস নয়,
এ আমাদের ভাবনা, আমাদের পথচলা"

bengaltimes.in

ISBN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমর্স

১৫ আগস্ট, ২০২৬

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

1 স্বাধীনতার আড়ালে অন্য এক ১৫ আগস্ট
❑ ময়ুখ নস্কর

2 উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী
❑ জগবন্ধু চ্যাটার্জি

3 মোহনবাগানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল তারিখটা
❑ সোহম সেন

রাজনীতি

1 কে বলল দরজা খুলবে না? ঠিক খুলবে
❑ উত্তম জানা

2 সিবিআই-কে ম্যাচরিপোর্ট পড়ানো হোক
❑ সরল বিশ্বাস

3 করুণা হচ্ছে এই বিধানসভার ওপরই
❑ স্বরূপ গোস্বামী

4 প্রিভিলেজ মোশান! কোথায় পাঠাবেন?
❑ সরল বিশ্বাস

স্মৃতিটুকু থাক

1 ভোলবাবা অভিযান

2 সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

bengaltimes.in

ISSN
2445 5657

সিনেমা

1 ছবির মধ্যে ছবি, তার আড়ালেই রাহুলের অমরত্ব
❑ স্নেহা সেন

2 বিপ্লবী নাকি ডাকাত! অনন্ত যেন অন্তহীন প্রশ্ন
❑ বিশ্বার মিশ্র

খেলা

1 অশ্রুতে মিশেছিল পাহাড়ের হাসি
❑ শ্রাবণ রায়

2 মহাকালের আঙিনায় থেকে যাবেন নেইমার
❑ অজয় নন্দী

ভ্রমণ

1 নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা: কাফের গাঁও
❑ উত্তম জানা

2 জটায়ু থাকলে নির্ঘাত লিখতেন, সারান্ডায় স্যারেন্ডার
❑ কুন্তল আচার্য

bengaltimes.in | ISSN 2445 5657

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সংশয়

এই তো সেদিন, খুব ঘটা করে পালিত হল স্বাধীনতার ৭৫ বছর। দেখতে দেখেতেই পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল! এবার আশি বছরে পা রাখল আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

লালকেল্লায় পতাকা ওড়ে, পাড়ায় পাড়ায় বেজে ওঠে দেশাত্মবোধক গান। সেই ছবিগুলো হয়তো একই আছে। কিন্তু অনেক চেনা ছবি যেন বদলেও যাচ্ছে। দেশ মানে এখন সবাইকে নিয়ে পথ চলা নয়। ক্রমাগত বিভাজনের হুঙ্কার ভেসে আসছে। ধর্মের নামে উস্কানি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, শাসক প্রতিমুহূর্তেই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে, তাঁরা সবার শাসক নন। খোদ সংসদের ভেতর থেকে দেশ নায়কদের বিরুদ্ধে চলছে অবিরাম ঘৃণাবর্ষণ। সংবিধান বদলে ফেলার, ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো বদলে ফেলার হুঙ্কার অহরহ ভেসে আসছে। কোনও অর্বাচীন এই জাতীয় হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন, এমনও নয়। এইসব হুঙ্কার আসছে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়া ‘দায়িত্বশীল’ আসন থেকেই।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি হয়তো আছে। কিন্তু তার থেকে উন্নততর কোনও মডেল এখনও আবিষ্কার হয়নি। ভারত নানা ধর্মের, নানা ভাষার, নানা মতের দেশ। বৈচিত্র্য আছে, আবার বৈচিত্র্যের মাঝে সুমহান ঐক্যও

আছে। এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের ভিত্তি বেশ সুদৃঢ়। বহির্বিশ্বের কাছে এটাই ভারতের গৌরবের দিক। কিন্তু সেই কাঠামো কতদিন অক্ষুন্ন থাকবে, তা নিয়েও বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

এক দলের প্রতীকে নির্বাচিত সাংসদ, বিধায়করা কী অবলীলায় অন্য দলে ভিড়ে যাচ্ছেন। শাসকও কী অবলীলায় তাঁদের দলে নিয়ে নিচ্ছে। বিরোধীরা আইনের ফাঁক খুঁজবেন, এটা হয়েই থাকে। এখন দেখা যাচ্ছে, শাসকও আইন মানার বদলে আইনের ফাঁক খুঁজতে বেশি ব্যস্ত। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা কেন্দ্র থেকে রাজ্য, সর্বত্র। বিরোধীদের লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে দলে টেনে নেওয়াই যেন বিরাট এক কৃতিত্ব। মূলস্রোত গণমাধ্যমও নিন্দার বদলে ধন্য ধন্য রব তুলতে ব্যস্ত। সরকার নয়, যাবতীয় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু যেন বিরোধীরা। একটু ভিন্নমত হলেই পাকিস্তান আর বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার নিদান আসে। উন্নত কোনও দেশের সঙ্গে আর তুলনা হয় না। তুলনা করতে হলে সেই পাকিস্তান আর বাংলাদেশের কথাই মনে পড়ে। দেশ কতটা এগিয়ে চলেছে, এই তুলনা থেকেই পরিষ্কার।

একটা দেশ ততটাই স্বাধীন, যতটা স্বাধীন তার গণমাধ্যম। অন্তত ভারতের মূলস্রোত টিভি চ্যানেল বা কাগজের দিকে তাকালে স্তাবকতার নগ্ন চিত্রটাই বড় বেশি করে বেআব্রু হয়ে পড়ে। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই ঘৃণার কোনও বিরাম নেই। তাই যতই পতাকা তুলি, যতই বন্দেমাতরমে সুর মেলাই, আমাদের স্বাধীনতার পরিসর কতটা বিস্তৃত, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

কে বলল দরজা খুলবে না? ঠিক খুলবে

উত্তম জানা

বছর দুই আগের কথা। এঁরাই বলেছিলেন, ‘আমাদের নেত্রী দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে এবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখতে চাই।’ এখানেই নেমে থাকেননি। এঁরাই বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশকে রসাতলে পাঠাচ্ছেন। বিজেপি দেশের সংস্কৃতিকে উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে।

অর্থাৎ, একদিকে নেত্রীর ঢালাও প্রশস্তি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নামে তীব্র সমালোচনা। অথচ, বিধানসভার ফল একটু উল্টে যেতেই এঁদের অবস্থান যেন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। এখন তৃণমূল নামটা শুনতেও এঁদের যত আপত্তি। অন্যদিকে, দন্ত বিগলিত করে প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনছেন। এখন তাঁদের কথা শুনে মনে হবে, তৃণমূলের

মতো খারাপ দল নেই। আর বিজেপির মতো ভালো দল সারা পৃথিবীতে নেই।

তাঁদের এখন ঠিকানা কী? তাঁরা নাকি এনডিএ–র শরিক। তাঁরা নাকি এখন এনসিপিআই–এর সাংসদ। অথচ, কয়েক মাস আগে এই সাংসদেরা এই দলটির নামই শোনেননি। কিন্তু এনসিপিআই বললে যদি এলাকায় কেউ পাত্তা না দেয়! যদি বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান! যদি পরেরবার টিকিট না পাওয়া যায়! তাই এঁদের অধিকাংশই সরাসরি বিজেপিতে যাওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করছেন। আপাতত বিজেপি অবশ্য সরাসরি দরজা খুলতে খুব একটা উৎসাহী নয়।

রাজনীতিতে দলবদল নতুন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। যে ভোটে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, সেই ভোটের রাজনৈতিক পরিচয়টুকু কি তাঁর সঙ্গে থাকবে না? তৃণমূলের প্রতীকে ভোট দিয়ে যে মানুষটি একজন সাংসদকে দিল্লিতে পাঠালেন, তিনি কি তাঁকে এনডিএ–র সাংসদ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন? অবশ্যই নয়। তিনি ভোট দিয়েছিলেন একটি নির্দিষ্ট দল, তার প্রতীক এবং তার রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে। অথচ নির্বাচনের পর সেই অবস্থান বদলে গেল। যুক্তি হতে পারে—জনস্বার্থ, উন্নয়ন, এলাকার স্বার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ‘উন্নয়ন’-এর ঠিকানা কি ভোটের আগে জানা ছিল না?

এখানেই গণতন্ত্রের অস্বস্তি। ২০ জন তৃণমূল সাংসদ পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে এনসিপিআই–তে যাওয়ার ঘোষণা করেছিলেন এবং পরে এনডিএ–র সংসদীয় বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বাংলার উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁরা কেন্দ্রের শাসক জোটকে সমর্থন করছেন। যুক্তিটা শুনতে হয়তো বেশ সুন্দর। কিন্তু গণতন্ত্রে

সৌন্দর্যের পাশাপাশি জবাবদিহিও দরকার। ন্যূনতম মূল্যতম, ন্যূনতম চক্ষুলজ্জাটুকু তো থাকতে হয়। এঁরা সেটুকুও বিসর্জন দিয়েছেন। ভোটার যদি বিরোধী দলকে ভোট দেন, আর নির্বাচিত প্রতিনিধি পরদিন ক্ষমতাসীন শিবিরের পাশে দাঁড়ান, তাহলে ভোটের পছন্দটির মূল্য কোথায় থাকে?

এখানে আরও একটি মজার দিক আছে। বিজেপিও আপাতত এই 'পর্যটকদের' সবাইকে নিজের ঘরে তুলে নিতে চাইছে না। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জুন মাসেই বলেছিলেন, তৃণমূলের নেতাদের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধ; 'তৃণমূলীকরণ' হতে দেওয়া হবে না। ' কিন্তু কতদিন এই দরজা বন্ধ থাকবে! যে কোনওদিন সেই আলিবাবা চল্লিশ চোরের মতো শোনা যাবে, 'খুল যা সিম সিম'।

একদিকে বিরোধী শিবির থেকে সাংসদ বেরিয়ে এসে শাসক জোটকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে শাসক দলেরই একটি অংশ বলছে—এসে দাঁড়ান, কিন্তু আমাদের দলের সদস্য হওয়ার দরজা এখনই খোলা নেই। রাজনীতির অভিধানে এর নাম হয়তো কৌশল। সাধারণ মানুষের অভিধানে? সুবিধামতো অবস্থান বদল।

আর এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা বিজেপির কাছেও। যদি তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের বিরুদ্ধে এতদিন এত অভিযোগ থাকে, তাঁদের 'দূষিত রাজনীতি'র বিরুদ্ধে এত কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের সমর্থন হঠাৎ এত মূল্যবান হয়ে ওঠে কেন? আবার যদি তাঁরা সত্যিই জনস্বার্থে নতুন অবস্থান নেন, তাহলে তাঁদের গ্রহণ করতে দ্বিধা কোথায়? আসলে উত্তরটা সম্ভবত খুব সরল—রাজনীতিতে নীতি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সংখ্যাও ততটাই। ক্ষমতার অঙ্কে একটি সাংসদ মানে একটি ভোট। একটি ভোট মানে কখনও একটি বিলের হিসাব বদলে যাওয়া। আর সেই অঙ্কে ভোটারের দেওয়া রায় কোথায় থাকে, সেটাই ক্রমশ বড় প্রশ্ন।

দলবদলের এই সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত মানুষকে একটি বিপজ্জনক শিক্ষা দেয়—ভোট আপনার, কিন্তু ভোটের পর সিদ্ধান্ত আমার।তখন নির্বাচিত প্রতিনিধি আর দলের প্রতীকের প্রতিনিধি থাকেন না; হয়ে ওঠেন নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। গণতন্ত্রের জন্য এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে? ভোটের আগে দরকার জনতার সমর্থন। ভোটের পরে দরকার ক্ষমতার সমর্থন। বেচারা ভোটার! তাঁর ভোটের কোনও মূল্যই রইল না। তাঁর ভোটকে কার্যত নিলামেই তোলা হল।

সিবিআইকে ম্যাচরিপোর্ট পড়ানো হোক

সরল বিশ্বাস

খেলা শুরু রাত সাড়ে বারোটায়। স্বাভাবিক নিয়মেই খেলা শেষ হতে রাত আড়াইটে বাজার কথা। আপাতভাবে আমরা নব্বই মিনিট ধরি। কিন্তু মাঝে পনেরো মিনিটের বিরতি। দুই অর্ধে দু'বার ইনজুরি টাইম। সবমিলিয়ে অন্তত দু'ঘণ্টারই ব্যাপার।

বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে কথা। মাঝে প্রায় আধঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খেলা নব্বই মিনিটে শেষ হল না। অতএব এক্সট্রা টাইম। মানে, আরও আধঘণ্টা। বিরতি, ইনজুরি টাইম। সবমিলিয়ে আরও প্রায় আধঘণ্টা। অর্থাৎ, শেষ বাঁশি বাজতে রাত পৌনে চারটে। এরপর কেউ উল্লাস করছেন, কেউ হতাশ। কেউ সারা মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মাঠে কাতারে কাতারে লোক। পুরস্কার বিতরণী শুরু হতে অন্তত আধঘণ্টা। সেখানে কাপ দেওয়া হবে সবার শেষে। তার আগে রেফারিদের পুরস্কার। সব দলের ফুটবলারদের আলাদা করে পুরস্কার। নানা

বিভাগের সেরাদের পুরস্কার। সবার শেষে কাপ দেওয়া। তারপর সেই কাপ নিয়ে আরও একপ্রস্থ সেলিব্রেশন। এই সব হতে হতে প্রায় ভোর।

খবরের কাগজের ব্যস্ততা তখন কেমন? তা নিয়ে লিখতে গেলে একটা দীর্ঘ উপন্যাস হয়ে যেতে পারে। একেকজন একেক কাজে ব্যস্ত। কেউ বিশেষজ্ঞের লেখা লিখছেন। কেউ মুড কপি লিখছেন। কেউ বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখছেন। কেউ প্রুফ দেখছেন। বিদেশ থেকে দ্রুত কেউ কপি পাঠাচ্ছেন। কেউ এডিট করছেন। কেউ হয়তো ছবি সিলেকশন করছেন। কেউ দ্রুত ছবি কারেকশন করছেন। কেউ ক্যাপশনে মন দিয়েছেন। কেউ ভাবছেন শিরোনাম নিয়ে। কেউ পাতার ডিজাইন সাজাচ্ছেন। ট্রফি দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই পেজ রিলিজ হয়ে গেল। তারপর

সেটা পিডিএফ হচ্ছে, প্রেসে যাচ্ছে। প্রেসের কর্মীরা নিজের ইনজের কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ গুনে গুনে প্যাকিং করছেন। কেউ গাড়িতে তুলছেন। কোনও গাড়ি ছুটছে শিয়ালদার দিকে, কোনওটা হাওড়ার দিকে। কোনওটা ধর্মতলার দিকে। কেউ আবার বিভিন্ন সেন্টারে যাচ্ছেন কাগজ দিতে।

মোদ্দা কথা, সাড়ে চারটের পর ট্রফি দেওয়া হল। সব রকম কপি ও ছবি সমেত, সেই কাগজ বিভিন্ন সেন্টারে পৌঁছে গেল সকাল সাড়ে পাঁচটা, ছটার মধ্যে। সেখান থেকেই হকাররা কাগজ তুলছেন। আপনার বাড়িতে সেই কাগজ পৌঁছে গেল সকাল ছটা, সাড়ে ছটা নাগাদ, বড়জোর সাততা। কী আশ্চর্য, আপনি কাগজ হাতে নিয়ে দেখছেন, সেখানে প্রায় সবকিছুই আছে। ম্যাচের বিস্তারিত রিপোর্ট আছে, নানা রকম পরিসংখ্যান আছে, বিশেষজ্ঞদের লেখা আছে, আমেরিকা থেকে পাঠানো রিপোর্টারের কপি আছে, গোলের ছবি আছে, সেলিব্রেশনের ছবি আছে, হতাশার ছবি আছে, ট্রফি হাতে দৌড়ের ছবি আছে। তাহলেই ভেবে দেখুন, ম্যাচ শেষ হওয়ার দু ঘণ্টার মধ্যে এত হাত ঘুরে সেই কাগজ আপনার বাড়িতে চলে এল।

অথচ, সিবিআই বা ইডির চার্জশিট কোর্টে জমা হতে তিন বছর, চার বছর লেগে যায়। একটা শুনানির পর পরবর্তী শুনানির জন্য দু মাস, তিন মাসের সময় দেওয়া হয়। সমস্ত খবরের কাগজের কর্মীরা যেটা দু'ঘণ্টায় করে ফেলেন, রাষ্ট্রের এত এত ক্ষমতা ও প্রযুক্তি নিয়ে সিবিআই সেটা এক বছর লাগিয়ে দেয়। এরপর ভেবে দেখুন, সিবিআই-কে গালাগাল দেবেন নাকি খবরের কাগজকে গালাগাল দেবেন।

এখন নাকি কাগজ পড়া যায় না। সব কাগজ 'চটিচাটা'— এমনটাই তো গত কয়েক বছরে শুনে এসেছি। অথচ, যে লোকগুলো সিবিআই-কে চালনা করেন, তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যায়।

বছরের পর বছর, নানা তদন্তে সিবিআই আর ইডি নামের দুটো সংস্থা যে কী সীমাহীন অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা এর পরেও বুঝবেন না! এই সিবিআই-কে যাঁরা বছরের পর বছর চালাচ্ছেন, তাঁদের কবে আর লজ্জা হবে!

সিবিআই কর্তাদের বরং খবরের কাগজে কয়েক মাসের জন্য ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হোক। কীভাবে দ্রুত কাজ করতে হয়, ভাল করে শেখানো হোক।

স্বাধীনতার আড়ালে অন্য এক ১৫ আগস্ট

স্বাধীনতা দিবসের কথা সবাই জানি। কিন্তু তার আড়ালে আরও কতকিছু চাপা পড়ে রইল। এই পনেরোই আগস্ট যে আরও অনেককিছু। সবদিকেই আলো ফেললেন ময়ূখ নস্কর।

ভারত হয়তো নব্বই বছর আগেই স্বাধীন হয়ে যেত। হল না এক সর্বনেশে ১৫ আগস্টের জন্য।

১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট পূর্ব ভারতে চালু হল রেল চলাচল। প্রথম দফায় সেই রেলের যাত্রাপথ ছিল হাওড়া থেকে হুগলী। মধ্যপথে রেল থেমেছিল বালি, শ্রীরামপুর আর চন্দননগরে। এর এক বছর আগেই বম্বে থেকে থানে রেল চালু হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার লাগোয়া হাওড়ায় রেল যোগাযোগ চালু হওয়ার গুরুত্বই ছিল আলাদা। দেশ জুড়ে রেলপথ পাতার সুবিধা ইংরেজরা পেয়েছিল কয়েক বছর পরে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেনা পাঠাতে পেরেছিল। আধুনিক প্রজুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দেশ স্বাধীন হল না বটে, কিন্তু ভারতের সমাজ জীবনের খোল নলচে বদলে দিল রেল। এই পরিবর্তনের তার বিবরণ পাওয়া যায় রমাপদ চৌধুরির "প্রথম প্রহর" উপন্যাসে। প্রথম প্রথম সবাই ভেবেছিল "ও গাড়িতে উঠলে জাত যাবে সকলের। বামুন বাগদির তফাত নেই, সব গায়ে গা দিয়ে নাকি বসতে হয়।" সবাই ভেবেছিল, ওই গাড়ির জন্যই নাকি কলেরার মড়ক লেগেছে। তারপর আস্তে আস্তে প্রয়োজনের তাগিদে কুসংস্কার উড়ে গেল। "তারপর ক্রমশ দেখা গেল গ্রামের মেয়েরা রেলগাড়ির পুজো করে ঘরে ঘরে, রেলের দৌলতেই নাকি দুর্ভিক্ষ গেছে দেশ থেকে, খেয়ে পরে বেঁচেছে তারা। "

মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন করে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হতে হয়তো কিছু দিন দেরি হতো। কিন্তু তার গতি দ্রুত করল দুটি পৃথক ১৫ আগস্ট।

১৮৭২ সালে কলকাতার ঘোষ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন শ্রী অরবিন্দ। ১৫ আগস্টের জাতক এই ছেলেই একদিন আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবেন, ব্রিটিশের গোলামি করবেন না বলে। বরোদা-রাজের চাকরি ছেড়ে যোগ দেবেন সশস্ত্র সংগ্রামে। তাঁর হাত ধরেই বাঙলার মাটিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটবে। উত্তরকালে সক্রিয় রাজনিতি থেকে আধ্যাত্মিকতায় সরে গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে

অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর অবদান। এসবের মধ্যেই ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয় মোহনবাগান ক্লাব। এই ক্লাবের সঙ্গে ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতন। যে বছর ক্লাব প্রথম আই এফ এ শিল্ড জিতল সেই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ হল। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে।

ক্লাবের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল নানা মিথ। ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের পর, এক সমর্থক নাকি ফোর্ট উইলয়ামের মাথায় উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাকটিকে দেখিয়ে বলেছিল, 'শিল্ড তো জিতলে, ওটাকে নামাবে কবে?' উত্তর এসেছিল, 'যেদিন আবার শিল্ড জিতব সেদিন।' কাকতালীয় হলেও মোহনবাগান দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতল ১৯৪৭ সালে, আর সেই বছরেই স্বাধীন হল দেশ। বলা বাহুল্য ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৫ আগস্ট।

১৫ আগস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও কিছু জন্ম ও মৃত্যু। ১৯২৬ সালে কলকাতার কালিঘাটে মামাবাড়িতে যিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি কালে কালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের উত্তরসূরি হয়ে উঠবেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বহুদিন সক্রিয় থাকবে তাঁর কলম। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৩ মে ......
"যাদবপুরের মাঠে শিরীষের ছায়া দীর্ঘ হয়
বেলা পড়ে আসে, দেখি মেঘ আনে পরম
বিস্ময়।"
যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে বিদায় নিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য।
বিদেশের দিকে চোখ ফেরালে দেখি, ১৭৬৯ সালে এই দিনেই জন্মেছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন।

তবে ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি বাংলাদেশে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নজির আছে তাকে এককথায় নোংরামি বলা যায়। এপার বাংলা হোক বা অপার বাংলা- ১৫ আগস্ট মানে তো শুধু স্বাধীনতা নয়- ১৫ আগস্ট মানে দেশভাগের স্মৃতি, ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি। সেই ১৫ আগস্টের গায়ে আরও এক পোঁচ রক্ত লেগেছিল ১৯৭৫ সালে। সেদিন ভোরে ভারত যখন স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে মত্ত, তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে চলছে নারকীয় হত্যালীলা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাসস্থানে চড়াও হয়েছে বিদ্রোহী সেনারা। আততায়ীদের নির্বিচার গুলিতে শেষ হয়ে গেল গোটা পরিবার। সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন শেখ মুজিব। নিহত হলেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র কামাল, জামাল এবং রাসেল। রাসেলের বয়স তখন মাত্র দশ। বিদেশে থাকায় বেঁচে গেলেন দুই কন্যা হাসিনা এবং রেহানা।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গোলমাল পাকালেন জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি জানালেন, ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন, অতএব ওই দিন তাঁর সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করবেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের তরফে বেগম খালেদার এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। খালেদার বিরোধীরা বলেন, ম্যাট্রিকু-লেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী, খালেদার জন্মদিন ৯ আগস্ট ১৯৪৫। বিবাহ সার্টিফিকেট অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। পাসপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট ১৯৪৫। ১৫ আগস্ট জন্মদিনের সপক্ষে কোনও প্রমান নেই।

বিশ্বের ইতিহাসে আরও চোখ বলালে দেখা যাচ্ছে, শুধু ভারত নয়, আরও অনেক দেশেরই স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপানের কবল থেকে স্বাধীন হয়েছিল কোরিয়া, ১৯৪৮-এর এই দিনেই দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ১৯৬০ সালের এই দিনেই ফ্রান্সের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়েছিল রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ১৯৭১ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাহরিন।

এবং ভারত। ১৫ আগস্ট স্বাধীন হওয়া দেশ-গুলির তালিকায় কিন্তু ভারতের নাম থাকার কথাই ছিল না। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু তার বদলে ভারত যে ’৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন হল, তার জন্য দায়ী ছিল আর এক ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের এই দিনেই মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল জাপান। শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৬ আগস্ট হিরোশিমা আর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর জাপানের পক্ষে আর লড়াই চলান সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা হয়তো চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের মতই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে ভারতকে। তাই হাতে এক বছরেরও বেশি সময় থাকলেও নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারত ছেড়ে বিদায় হবে ইংরেজ। সঙ্গে হবে দেশভাগ। দেশ যে ভাগ হবেই তা অবশ্য এক বছর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬-এর ১৫ আগস্টের রাতে ভারতবাসী ধর্মের নামে নিজের নিজের অস্ত্রে শান দিয়েছিল। পরদিন শুরু হয়েছিল ভাইয়ের রক্তে হোলি খেলা। তেলের শিশির মতো ভেঙ্গে গিয়েছিল আমাদের দেশ।

এত বছর পরেও যখন ১৫ আগস্টের কথা ওঠে, আমরা ভুলতে পারি না, ভাঙনের পথে এসেছিল আমাদের স্বাধীনতা, তার গলায় দুলেছিল রক্তমণির হার।

উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

ভারত যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন কোথায় ছিলেন গান্ধীজি? উত্তরটা হল, কলকাতায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বেলেঘাটায়।

লালকেল্লায় যখন স্বাধীনতার উৎসব হচ্ছে, গোটা দেশে যখন পতপত করে তেরঙা উড়ছে, তখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে জাতির জনক। উৎসব আর কোলাহল থেকে অনেক দূরে। তিনি তখন দুই সম্প্রদায়কে আরও কাছাকাছি আনার সাধনায় মগ্ন।

দেশ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। মন থেকে তা মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজি। সেই যন্ত্রণার কথা দ্ব্যর্থহীনভাষাতেই বারবার বলেছেন। স্বাধীনতার আগের দিন, অর্থাৎ ১৪ আগস্ট কলকাতার মারওয়াড়ি ক্লাবে গান্ধীজি

বলেছিলেন, 'কাল ইংরেজ শাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব। কাল থেকে আমরা স্বাধীন। কিন্তু আজ রাত থেকে আমার ভারত দু টুকরো হয়ে যাবে।'

তার কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, 'আমার দেশ আনন্দ করবে। আমি চাই, আপনারাও আনন্দ করুন। কিন্তু আমি সেই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে পারব না। কারণ, এমন স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি। এই স্বাধীনতা আগামীদিনে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিভাজনের বীজ পুঁতে যাবে। এই অবস্থায় আমি কী করে মশাল জ্বালাতে পারি?'

দেশের নানাপ্রান্তে শুরু হয়ে গেল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। একদিকে নেতারা ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারায় মগ্ন। অন্যদিকে এক সম্প্রদায়ের হাতে মরছে আরেক সম্প্রদায়ের নীরিহ মানুষ। গান্ধীজি ১৩ আগস্ট এলেন বেলেঘাটায়। কারণ, এখানে দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে মিলেমিশে আছে। গান্ধী এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে গোটা দেশকে এক সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাইলেন। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, 'পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে। সেখানে দাঙ্গা থামাতে আমরা ৫৫ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছি। বাংলায় শুধু একজন। ওয়ান ম্যান আর্মি। সেই মানুষটা একাই প্রাচীর হয়ে দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছে।'

পনেরোই আগস্ট সেই মানুষটা কোথাও যাননি। বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে প্রার্থনা করে গেছেন আর একা একা চরকা কেটেছেন। না, সারাদিন কিছুই মুখে তোলেননি। উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী।

মোহনবাগানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল তারিখটা

সোহম সেন

মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি তারিখ। নিশ্চয় প্রথমেই ২৯ জুলাইয়ের কথা মাথায় আসছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই দিনটিকেই মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনই ধুমধাম করে নানা অনুষ্ঠান নয়। এই দিনই মোহনবাগান রত্নও দেওয়া হয়। এই দিনেই প্রাক্তন-বর্তমানের পুনর্মিলন হয়।

কিন্তু গুগল বাবাজির সাহাজ্যে একবার মোহনবাগানের পেজে ঢুকুন। দেখবেন ১৫ আগস্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। অথচ, দিনটার কথা অনেকেই জানেন না। খোদ মোহনবাগা-নের সদস্য-সমর্থকদেরও অনেকেই জানেন না এই তারিখটির অস্তিত্বের কথা। আসলে, কাগজ-কলমে যতই দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, এই দিনটির সঙ্গে মোহন-জনতার নাড়ির সেই যোগসূত্র কখনও তৈরিই হয়নি।

তাহলে, কীভাবে এল এই ১৫ আগস্ট? নানা গল্প চালু আছে। তবে সবথেকে বেশি যে কারণটা শোনা যায়, তা হল, এই তারিখটি মোহনবাগান সভাপতি ধীরেন দে-র তৈরি করা। মোহন-বাগানের শতবর্ষ পালন হয়েছিল বেশি ঘটা করেই। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে। তিনি এসেওছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে মোহনবাগানকে জাতীয় ক্লাব বলে উল্লেখ করেন। শোনা যায়, সেই থেকেই নাকি জাতীয় ক্লাব শব্দদুটো মোহনবাগানের সঙ্গে জুড়ে যায়।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রধানমন্ত্রীকে

যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন ধীরেন দে-কে বলা হয়েছিল, কবে ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়, সেই তারিখ লিখতে। সত্যিই তো দিনক্ষণ দেখে এই ক্লাব তৈরি হয়নি। ঘটনা করে প্রতিষ্ঠাও হয়নি। তাই বিশেষ কোনও দিনকে চিহ্নিত করা মুশকিল। তখন ধীরেন দে বুদ্ধি করে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে লিখে দিলেন ১৫ আগস্ট তারিখটা। সেই থেকে এই তারিখটাই থেকে গেল প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে।

কানাইয়ালাল নয়, করুণা হচ্ছে এই বিধানসভার ওপরই

স্বরূপ গোস্বামী

নিজেকে ক্রমশ হাস্যকর করে তোলার প্রথা বজায় রেখেছে বিধানসভা। প্রতিদিন নিত্যনতুন কর্মকাণ্ড। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, বিধানসভা কাদের হাতে।

গত দুদিন ধরে বিভিন্ন কমিটি নিয়ে জল্পনা চলল। অবশেষে, স্পিকার মশাই সেই তালিকা প্রকাশ করলেন। মারাত্মক চমক। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হল কানাইয়ালাল আগরওয়ালাকে। কাকে কোন কমিটির চেয়ারম্যান করবেন, সেটা অবশ্যই স্পিকারের এক্তিয়ার। কিন্তু সেই এক্তিয়ার বা সিদ্ধান্ত কখনও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

গত দশ বছর ধরে এই কমিটি নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা চলছে। এমন এমন লোকেদের

এইসব চেয়ারে বসানো হয়েছে, যা বিধানসভার মর্যাদা একটুও বাড়ায়নি, বরং কলুষিত করেছে। পরিষদীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ন্যূনতম শ্রদ্ধা ও ধারণা থাকলে হয়তো এমনটা করা যায় না। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলেও এমনটা করা যায় না।

আচ্ছা, এই কমিটির কাজ কী? সহজ কথায় বলতে গেলে, সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, ত্রুটি খুঁজে বের করা, সরকারকে সতর্ক করা, নতুন দিশা দেখানো। কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট (সিএজি) এই কমিটি খতিয়ে দেখতে পারে। সেই রিপোর্টে কী কী পর্যবেক্ষণ আছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা, বিভিন্ন আমলাদের ডেকে পাঠিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া এই কমিটির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সেই নিরিখে তাঁরা বিধানসভার কাছে তাঁদের সুপারিশ তুলে ধরবেন।

সত্যিই, কানাইয়ালালের যে এত প্রতিভা, আমাদের জানাই ছিল না। কানাইয়ালাল সিএজি রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন, তার ভুল বের করবেন, সরকারকে দিশা দেখাবেন। ভাবতে গেলেও বুকের পাটা লাগে। যাঁরা তাঁকে এই কাজের যোগ্য মনে করলেন, তাঁদেরও খুরে খুরে দণ্ডবৎ। আর কোনও লোক পেলেন না! শেষে কানাইয়ালাল!

তৃণমূল সরকারের প্রথম দফায় অরুণাভ

ঘোষকে একবার ডেকে পাঠায় বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সোনালি গুহ। অরুণাভবাবুর বক্তব্য ভাল করে না শুনেই মনগড়া একটা রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। প্রায় দেড়শো পাতার রিপোর্ট বিধানসসভায় পেশ হয়। অরুণাভ ঘোষকেও তলব করা হয়। তিনি ভারী মজার একটা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই রিপোর্টের তলায় যাঁর সই আছে, তিনি দয়া করে এক পাতা রিডিং পড়ে দিন। যদি রিডিং পড়তে পারেন, যে শাস্তি দেবেন, পাতা পেতে নেব। বলাই বাহুল্য, সেদিন ডেপুটি স্পিকার এই চ্যালেঞ্জটুকু গ্রহণ করার সাহস দেখাননি।

কানাইয়ালাল সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করা হয়তো শোভনীয় নয়। কিন্তু যাঁকে

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মাথায় বসিয়ে দেওয়া হল, তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সেদিন অরুণাভ ঘোষ যেভাবে বলেছিলেন, সেই ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে করে, সিএজি রিপোর্টের বিশ্লেষণ তো দূরের কথা, ওই রিপোর্ট পড়ে তার পাঁচ পার্সেন্ট বোঝার ক্ষমতা কানাইয়ালালের আছে তো? তিনি সরকারকে দিশা দেখাবেন! কানাইয়ালালের নামে যে ছাপা রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হবে, তিনি নিজে তা একপাতা রিডিং পড়তে পারবেন তো?

সাধারণত, বিরোধী দলের সিনিয়র, লেখাপড়া জানা কোনও লোককে এই কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাকে চেয়ারম্যান করা হবে, তা বিরোধীদের হাতেই ছেড়ে রাখা হয়। এক্ষেত্রে ঋতব্রত শিবির হয়তো কানাইয়ালালের নামই পাঠিয়েছিল। স্পিকার তাতেই সিলমোহর দিয়েছেন। সেদিক থেকে আইনগত কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু কাকে রাজার পার্ট দেওয়া হচ্ছে, খতিয়ে দেখা হবে না! এক, দুই, তিন করে তিনটি নাম জমা দেওয়ার প্রথা। স্পিকার চাইলে সেই তিনজনের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারেন। বেছে বেছে গঙ্গারামকেই কিনা পাত্র হিসেবে বেছে নিলেন!

বাম জমানায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হতেন সুব্রত মুখার্জি, সত্য বাপুলিরা। তৃণমূল প্রথম পাঁচ বছর বিরোধীদের পছন্দকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু ২০১৬ থেকে স্পিকার মশাই নিজের ইচ্ছেমতো চেয়ারম্যান বানাতে শুরু করলেন। কখনও মানস ভুঁইয়া, কখনও শঙ্কর সিং, কখনও মুকুল রায়, কখনও কৃষ্ণ কল্যাণী, কখনও সুমন কাঞ্জিলাল। খাতায় কলমে এঁরা বিরোধী সদস্য। কিন্তু একটা মস্তবড় মিল আছে। এঁরা সবাই দলবদলু। বিরোধীদের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে শাসক দলে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যেন দলবদলুদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেল। দলবদলের পুরস্কার হিসেবে এই পদ উপঢৌকন দেওয়া হল। এঁদের মধ্যে মানস ভুঁইয়ার যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু তিনি ততদিনে শিবির বদলে ফেলেছিলেন। ফলে, সরকারের ত্রুটি তুলে ধরার চেয়ে সাফাই গাওয়ার কাজেই বেশি মনযোগী হয়ে পড়েছিলেন।

এবারও কিছুটা মিল আছে। কানাইয়ালাল তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত। পরে নেত্রীকে ছেড়ে ঋত শিবিরে। অর্থাৎ, সরকার অনুমোদিত বিরোধী দলে। যাঁরা বিরোধিতার বদলে সরকারকে তোয়াজ করার রাস্তাই বেছে নিয়েছেন। এই কানাইয়ালাল সরকারের ত্রুটি তুলে ধরবেন! হাঁসালেন কত্তা।

মোদ্দা কথা, বিধানসভার সবথেকে মূল্যবান কমিটির চেয়ারম্যানের পদ আবার দলবদলুদের জন্যই। সরকার বদল হল। কিন্তু দলবদলু আর অযোগ্য লোকেদের মাথায় বসানোর প্রথা বন্ধ হল না। বহাল তবিয়তেই চলছে। কানাইয়ালালের প্রতি নয়, বিধানসভার প্রতিই বড় করুণা হচ্ছে।

প্রিভিলেজ মোশন! কোথায় পাঠাবেন!

সরল বিশ্বাস

দশ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে একজন প্রধান শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষায় বসতে পারেন। দীর্ঘদিন আইনজীবী হিসেবে কাজ করার পর একজন বিচারপতির আসনে বসেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায় এটাই দস্তুর। কিন্তু বিধানসভা যেন এর ব্যতিক্রম। এখানে প্রথমবার জিতেই স্পিকার হয়ে গিয়েছিলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির জমানাতেও সেই ট্র্যাডিশন। প্রথমবার জিতেই স্পিকারের আসনে রথীন্দ্র বসু।

ফল যা হওয়ার, তাই হচ্ছে। বিধানসভা পরিচালনার সাধারণ নিয়মগুলোও ঠিকঠাক জানেন না। অতীতে কী হয়েছে, কী হয়নি, সেই সম্পর্কে ধারণাও নেই। হাতে আড়াই মাসের মতো সময় পেলেন। এই আড়াই মাসে কাজের পদ্ধতি কিছুটা হয়তো শিখে নেওয়া যেত। সেই চেষ্টাটুকুও দেখা যাচ্ছে না।

বলা হয়, স্পিকারের পদটা সম্মানীয় পদ। তাঁকে নাকি অসম্মান করা যায় না। কিন্তু এই পদটা যে সম্মানীয় পদ, তা নিজেকে তো বুঝতে হবে। নিজের চেয়ারের সম্মানরক্ষার সবথেকে বেশি দায়িত্ব তাঁর নিজের। কিন্তু নিজে যদি নিজেকে

হাস্যকর করে তোলেন, তাহলে অন্যরা আর কতটুকুই বা সম্মানরক্ষা করতে পারবেন!

বিতর্ক তৈরি হয়েছে কুণাল ঘোষকে ঘিরে। দিনের পর দিন বক্তার তালিকায় তাঁর নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। তিনি কাকে বলবেন? সভার অভিভাবককেই বলার কথা। কিন্তু স্পিকার মশাই তাঁকে বলার সুযোগ করে দিতে পারছেন না। উল্টে তাঁকেই মার্শাল দিয়ে চ্যাংদোলা করে বের করে দিলেন। সেদিনের জন্য সাসপেন্ড করে দিলেন।

তিনি ভেবে বসলেন, ইতিহাসে তিনি বোধ হয় প্রথম এই কাজ করলেন। মার্শাল দিয়ে কোনও বিরোধী সদস্যকে বের করে দেওয়া বা শৃঙ্খলারক্ষায় মার্শালের হস্তক্ষেপটা বিধানসভার ইতিহাসে মোটেই নতুন কোনও ব্যাপার নয়। একটা রুটিন ঘটনা। অন্তত পঞ্চাশবার এমনটা ঘটেছে। কিন্তু স্পিকার মশাই না জানলে কী করা যাবে!

পরের দিন বলে বসলেন, কলঙ্কজনক ঘটনা। এমনটা নাকি কখনও হয়নি। তিনি জানেন না, অতএব হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাস আমি পড়িনি, অতএব তিনি কোনও উপন্যাস লেখেননি, ব্যাপারটা এইরকম। কুণাল ঘোষ তাঁর মতো করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, স্পিকার তাঁর মতো করে ব্যবস্থা নিয়েছেন। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। এবং এটা মোটেই নজিরবিহীনও নয়। কুণাল ঘোষের প্রতিবাদের পন্থা নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে, সমালোচনা থাকতে পারে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও হতে পারে।

কিন্তু একজন নির্বাচিত বিরোধী বিধায়কের নাম রোজ রোজ কেটে ফেলা হবে, এটা আরও বেশি লজ্জার। এবং এর দায় অবশ্যই স্পিকারের। বিরোধী হুইপ বক্তার তালিকা জমা দেবেন, এটাই প্রথা। কিন্তু কোন দলের কে বলবেন, সেটা তিনি ঠিক করতে পারেন না। অতীতে যখন তৃণমূল মূল বিরোধী দল ছিল, কখন বিরোধী বেঞ্চে কংগ্রেস, এসইউসিআই, জিএনএলএফ, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মতো বিরোধী দলও ছিল। তাঁরাও বলতেন। প্রতিটি বাজেটেই তাঁদের জন্যও সময় বরাদ্দ হত। জিএনএলএফের কে বলবেন, তা তৃণমূল হুইপ ঠিক করতেন না। ঠিক যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক বা আরএসপির পক্ষ থেকে কে বলবেন, সেটা সিপিএমের হুইপ ঠিক করতেন না।

এত বছরের প্রথা। স্পিকার মশাই জানেন না বলেই এই জটিলতা তৈরি হচ্ছে। আগে কীভাবে সময় বণ্টন হত, সেটা জানার চেষ্টাও করেছেন বলে মনে হয় না। এক তো মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়া হল। এতেই শেষ নয়। পরের দিন তাঁর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনা হল। আনলেন স্বয়ং পরিষদীয় মন্ত্রী। এবং কোনও আলোচনা ছাড়াই সেই মোশন গ্রহণ করা হল। বিধানসভাকে কোন নর্দমায় নামাতে চাইছেন? তিনি কুণাল ঘোষকে পরামর্শ দিচ্ছেন, এটা আপনাদের ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে মেটান। তাহলে তিনি সভার অভিভাবক হয়েছেন কেন? কে বিরোধী দলনেতা হবেন, সেটাও তো তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারই ছিল। সেখানে স্পিকারকে এত তৎপর হয়ে দিল্লি ছুটতে হল কেন? অতীতে কোনও স্পিকারকে বিরোধী দলে ভাঙন ধরাতে এমন তৎপরতা দেখাতে হয়নি। পরিষদীয় রাজনীতিতে এমন নির্লজ্জতার নজির ভারতবর্ষে আর একটা আছে? এটা যদি কলঙ্কজনক না হয়ে থাকে, তার থেকে বেশি কলঙ্কজনক আচরণ অন্তত কুণাল ঘোষ করেননি।

যাকে তাকে রাজার পার্ট দিলে মাঝখান থেকে যাত্রাটাই পণ্ড হয়।

স্মৃতিটুকু থাক

ভোলেবাবা অভিযান, সেই প্রথম গঞ্জিকায় টান

বিদ্যুৎ মণ্ডল

শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার একটা রেওয়াজ প্রায় সব জায়গায় আছে। বিশেষ করে বাবা তারকনাথ ছবি রিলিজ করার পর এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। অনেক জায়গায় এই জল ঢালার প্রথাকে 'ভোলে বাবা' বলা হয়।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলায় অনেকেই ছোটবেলায় ভোলেবাবা যেত। যত না ভক্তিতে, তার থেকে বেশি হুজুগে। ভোলেবাবা যাওয়া নিয়ে আমার একটি স্মৃতি আছে। নাম প্রকাশ হয়ে গেলে কিছুটা লজ্জায় পড়ব। তাই নিজের নাম গোপনই রাখছি। তবে ঘটনাটা বলা যেতেই পারে।

আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। শুশুনিয়ায় জল ভরে এক্তেশ্বরের মন্দিরে ঢালতে যাওয়ার কথা।

শুশুনিয়া থেকে ফেরার পথে একসঙ্গে জনা দশেক বন্ধু। তখন ভোলেবাবা মানে, অনেক নিষিদ্ধ কৌতূহলের হাতছানি। অনেকের সিগারেট খাওয়ার হাতেখড়ি হয় এই ভোলেবাবাতেই। সেবার কয়েকজনের ইচ্ছে হল, একটু গঞ্জিকা (গাঁজা) সেবনের। গন্ধেশ্বরীর পাড়ে এসে কয়েকজন বসে পড়লাম। এক বন্ধুর অভ্যেস ছিল। সে দিব্যি টান মেরে গেল।

এবার আমার পালা। আমিও চোক বন্ধ করে কয়েক টান দিলাম। সাময়িক বিরতি। কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আবার কয়েক টান। ব্যাস, নেশা ধরে গেল। গন্ধেশ্বরীর পাড় থেকে তখন আমাদের তোলে, কার সাধ্য! সেখানেই শুয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে বাকিরাও ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সূর্য উঠে গেছে। নিজেদের আবিস্কার করলাম নদীর পাড়ে। ওই অবস্থায় উঠে, বাঁক কাঁধে নিয়ে সবাই মিলে ছুটলাম বাঁকুড়ার পথে। জল ঢাললাম। মনে মনে বললাম, আমরা শিবের আদর্শ চ্যালা।

তারপরেও ভোলেবাবা গেছি। কিন্তু আর কখনও গঞ্জিকা চক্করে পড়িনি। তবে এখনও কাউকে ভোলেবাবা যেতে দেখলে গন্ধেশ্বরীর পাড়ে ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়।

স্মৃতিটুকু থাক

সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক মফস্‌সলে। আমাদের এলাকায় একজন পিওন এসেছিলেন। আমরা তাঁকে মাধবকাকু বলতাম। মাত্র কয়েক-দিনেই সবাইকে দিব্যি চিনে নিয়েছিলেন। কার কাছে কী ধরনের চিঠি আসে, কোন চিঠি কাকে দিতে হয়, ঠিক জানতেন।

একবার আমাকে খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এক বিয়ে-বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে যে এভাবে চিঠি লিখে ফেলবে, কে জানত! প্রেম নিবেদন করে মস্ত এক চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই চিঠি যদি বাবার হাতে যেত, নির্ঘাত বকুনি জুটত।

মাধবকাকু সেই চিঠি বাবার হাতে দেননি। আমাকে দেখতে পেয়ে একদিন ডাকলেন। বললেন, ‘তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। ইচ্ছে করেই বাড়িতে দিইনি। কোনও ভয় নেই। তোমার চিঠি আমি তোমাকেই দেব।’

এখন লোকে চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে। মাধবকাকুদের মতো চরিত্ররাও বোধহয় হারিয়ে গেছে।

পিয়ালি সেনগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর

(এই বিভাগ কিন্তু একান্তই পাঠকদের জন্য। আপনারাও লিখে পাঠান আপনাদের অনুভূতি। বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে? অতীতের কোনও কাজের জন্য ভুলস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? বলে ফেলুন। দেখুন, অনেক হালকা লাগবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

ছবির মধ্যে ছবি, তার আড়ালেই রাহুলের অমরত্ব

স্নেহা সেন

শুরুতে নাম ছিল নেগেটিভ। কিন্তু নাম বদলে হয়ে গেল ছবিওয়ালা। একটা ছোট্ট বদল আসলে অনেককিছুই বদলে দিল।

কিছু ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পর্দা থেকে নামতে চায় না। 'ছবিওয়ালা' তেমনই একটি ছবি। তার একটা কারণ অবশ্যই রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শুধু রাহুলের শেষ ছবি বলেই ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন শিল্পীর স্বীকৃতির লড়াই, সংসারের টানাপড়েন এবং নিজের প্রতিভাকে প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা—

এই কয়েকটি সরল উপাদান মিলিয়ে ছবিটি তৈরি করেছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণ আবহ।

ছবির কেন্দ্রে বিশ্বকর্মা। পেশায় চিত্রগ্রাহক। ছবি তোলেন, কিন্তু তাঁর ছবির নান্দনিকতা কেউ বুঝতে চায় না। বড় কাজ জোটে না। শেষ পর্যন্ত মৃত মানুষের ছবি তোলাই তাঁর জীবিকার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। অন্য দিকে স্ত্রী মালা সংসারের অভাব সামলাতে কারখানায় কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা আছে, কিন্তু অভাব এবং বিশ্বকর্মার নিজের শিল্পীসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জেদ সেই সম্পর্ককে ক্রমশ কঠিন করে তোলে।

এখান থেকেই গল্পটি অন্য দিকে মোড় নেয়। বিশ্বকর্মার মনে হয়, ভাল ছবি তুলতে গেলে তাকে এমন কোনও মুহূর্ত ধরতে হবে, যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। সেই খোঁজ তাকে নিয়ে যায় অন্ধকার এক জগতের দিকে। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হতে থাকে। শিল্পের সন্ধান কখন যে আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বকর্মা নিজেও বুঝতে পারেন না। এই জায়গাতেই ছবির কাহিনিতে থ্রিলারের উপাদান ঢুকে পড়ে, যদিও ‘ছবিওয়ালা’ শেষ পর্যন্ত কোনও সরল থ্রিলার নয়।

গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শান্তনু নাথ। চিত্রনাট্যের সবচেয়ে বড় সাফল্য, একটি অস্বাভাবিক ভাবনাকে মানবিক সম্পর্কের ভিতর ধরে রাখা। বিশ্বকর্মার শিল্পীসত্তা এবং মালার সংসারী বাস্তবতার সংঘাত ছবিটিকে শুধু ‘একজন শিল্পীর গল্প’ হয়ে থাকতে দেয় না। তবে কোথাও কোথাও গল্পের গতি একটু ধীর, কিছু অংশ আরও সংক্ষিপ্ত হলে ছবির টান বাড়তে পারত। তবু ছবিটি যে প্রশ্নটি তোলে—শিল্পীর স্বীকৃতি না পাওয়ার যন্ত্রণা কত দূর পর্যন্ত

একজন মানুষকে ঠেলে দিতে পারে—সেটি মনে থেকে যায়।

আর রাহুল? এখানে আবেগকে সরিয়ে রেখে তাঁকে দেখা কঠিন। বড় প্রিয় এক চরিত্র। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ‘সহজ কথা’ বাঙালির অনেক জটিলতাকে ঢেকে দিয়েছিল সারল্যের চাদরে। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বড্ড তাড়াতাড়িই যেন চলে গেলেন। কিন্তু শিল্পীর মাহাত্ম্য এখানেই, শিল্পী হারিয়ে গেলেও শিল্প থেকে যায়। রাহুলের এই কাজটাও থেকে যাবে। বিশ্বকর্মার চরিত্রটি যেন তাঁর জন্যই তৈরি। একদিকে জেদ, অন্য দিকে অসহায়তা। বাইরে থেকে খানিক অগোছালো, ভিতরে প্রবল সংবেদনশীল। রাহুল খুব বেশি অভিনয় করেননি; বরং চরিত্রটির একাকিত্বকে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন। চোখের দৃষ্টি, চুপ করে থাকা, স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ছোট মুহূর্ত—এই জায়গাগুলিতে তাঁর অভিনয় বেশি মনে থাকে।

সবচেয়ে অদ্ভুত সমাপতন, পর্দায় তিনি এমন এক শিল্পীর চরিত্রে, যিনি স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য লড়ছেন। বাস্তবেও রাহুল চলে গেলেন কাজের মধ্যেই। তাই ‘ছবিওয়ালা’ দেখতে বসলে কোথাও কোথাও চরিত্র আর অভিনেতার মধ্যে সীমারেখাটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। দেবলীনা দত্তও মালার চরিত্রে বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর অভিনয়ে সংসারের চাপ, ক্লান্তি এবং স্বামীর প্রতি টান—সবটাই সহজ ভাবে এসেছে। রাহুল-দেবলীনার সম্পর্কের দৃশ্যগুলিই ছবির আবেগের মূল জায়গা।

চিত্রনাট্যের কিছু জায়গায় আরও মসৃণতা দরকার ছিল। কিন্তু ছবিটির আন্তরিকতা অস্বীকার করা যায় না। আর শেষ দৃশ্যের পর যখন আলো জ্বলে ওঠে, তখন মনে হয়—আমরা শুধু বিশ্বকর্মাকে দেখলাম না, রাহুলকেও যেন আরও একবার দেখলাম। রাহুল নেই। কিন্তু ছবিওয়ালা রয়ে গেল। পর্দায়, স্মৃতিতে।

বিপ্লবী নাকি ডাকাত! অনন্ত যেন অন্তহীন প্রশ্ন

বিপ্লব মিশ্র

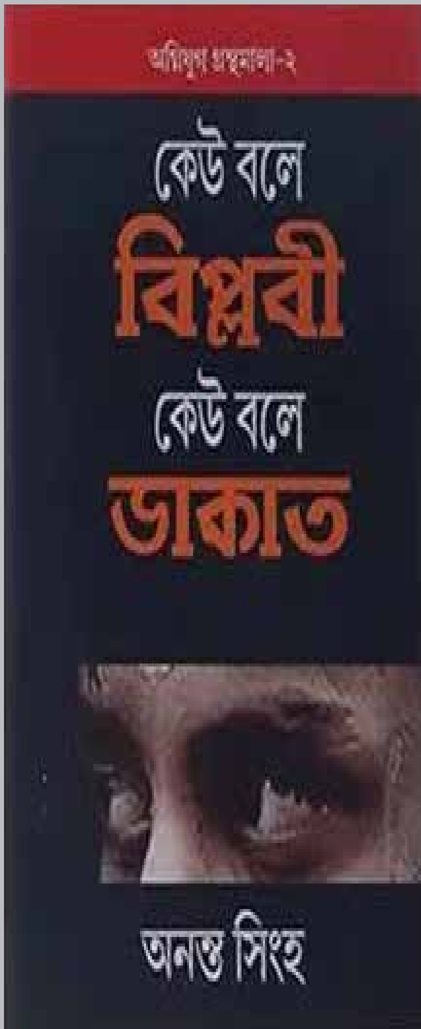

পুজোর আগে একঝাঁক বাংলা ছবি। কোনটা আগে দেখবেন, আর কোনটা পরে দেখবেন, এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই পুজো ফুরিয়ে যায়। ছবিগুলোও হল থেকে উধাও হয়ে যায়। একসঙ্গে এত ছবি মুক্তির আয়োজন কেন, কে জানে!

তার থেকে বরং কিছু ছবি আগে বেরিয়ে যাওয়া ভাল। আগস্ট মাস মানেই স্বাধীনতার মাস। একটু দেশাত্মবোধ জড়িয়ে থাকা ছবি মুক্তির আদর্শ সময়। সেদিক থেকে একেবারেই সঠিক সময়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বলতেই উঠে আসে একটি নাম, মাস্টারদা সূর্য সেন। কী বাংলা, কী হিন্দি, তাঁকে নিয়ে বেশ কয়েকটি ছবি হয়েছে। তাতে উঠে এসেছে তাঁর সহযোদ্ধাদের কথাও। এবার সেই সহযোদ্ধাই যেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। বরং মাস্টারদা হয়ে উঠেছেন পার্শ্বচরিত্র। তিনি যেন কিছুটা ‘বিবেক’ এর ভূমিকায়। সেদিক থেকে ভাবনা বেশ অভিনব।

ইতিহাসের কিছু চরিত্রকে এক কথায় চেনানো যায় না। তাঁরা একই সঙ্গে আলো এবং অন্ধকার, আদর্শ এবং বিতর্ক, নায়ক এবং অভিযুক্ত। অনন্ত সিংহ তেমনই এক চরিত্র। মাস্টারদা সূর্য সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক—আবার স্বাধীনতার পরের জীবনে যাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ডাকাতির অভিযোগ, রহস্য ও বিতর্ক। তাঁর নিজের আত্মজীবনীর নামই ছিল ‘কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী’। সেই নামেই পথিকৃৎ বসুর ছবি।

ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি তার বিষয় নির্বাচন। বাংলা সিনেমায় স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ছবি কম হয়নি, কিন্তু অনন্ত সিংহের মতো এত জটিল, দ্বন্দ্বময় চরিত্রকে সামনে এনে গল্প বলার চেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহসী। পরিচালক ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটিয়েছেন। ষাটের দশকের কলকাতায় একের পর এক ডাকাতি, তার পিছনে রহস্যময় অনন্ত, তাঁকে ধরতে পুলিশের মরিয়া চেষ্টা—এই বর্তমানের সঙ্গে ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে আসে চট্টগ্রাম, সূর্য সেন, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কারাবাস, আন্দামান। ফলে ছবিটি নিছক বায়োপিক হয়ে থাকেনি; বরং অনন্তকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ধরনের থ্রিলারও।

জিৎ এখানে নিজের পরিচিত নায়কসত্তাকে বেশ খানিকটা সরিয়ে রেখেছেন। বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে অনন্তকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর একাধিক লুক বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নয়টি আলাদা চেহারার পরিকল্পনা চরিত্রটির দীর্ঘ সময়ের যাত্রাকে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেছে। তবে জিতের আসল সাফল্য মেকআপে নয়, চোখে। অনন্ত

যখন বিপ্লবী, তখন তাঁর চোখে আগুন। আবার যখন সমাজের চোখে তিনি ডাকাত, তখন সেই চোখেই দেখা যায় এক অদ্ভুত স্থিরতা। তাঁর সংলাপ বলার ধরনেও পরিণত বয়সের অনন্তের ক্লান্তি ও জেদ ধরা পড়ে। টোটা রায়চৌধুরী, লোকনাথ দে, কৌশিক সেন, রজতাভ দত্ত, চন্দন সেন—সবাই মিলে ছবির অভিনয়-ভিত্তিটা শক্ত করেছেন। বিশেষ করে লোকনাথ দে-র মাস্টারদা সূর্য সেন চরিত্রটি ছবির আবেগের অন্যতম কেন্দ্র।

আর এখানেই ছবির একটি বড় সাফল্য—অনন্তকে সাদা-কালোয় না দেখানো। তিনি কি সত্যিই ডাকাত? নাকি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা একজন বিপ্লবী, যিনি স্বাধীনতার পরেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন? পরিচালক সরাসরি উত্তর চাপিয়ে দেন না। বরং দর্শককে প্রশ্নটির সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। কিন্তু ছবির দুর্বলতাও এখানেই।

ইতিহাসের এত বড় ক্যানভাসকে আড়াই ঘণ্টার মতো সময়ের মধ্যে ধরতে গিয়ে গল্প অনেক জায়গায় তাড়াহুড়ো করে এগিয়েছে। এক সময়কাল থেকে অন্য সময়কালে যাতায়াত কিছু দর্শকের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী অনন্ত এবং বিপ্লবী অনন্তের মধ্যে সেতুটি আরও মসৃণ হতে পারত। ছবির শেষভাগের আদালতের দৃশ্যও আরও নাটকীয়ভাবে নির্মাণ করা যেত। সমকালীন সময়কে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

আর একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—ইতিহাস ও কল্পনার সীমারেখাটি ছবিতে সবসময় পরিষ্কার নয়। কোনটি নথিভুক্ত ঘটনা, আর কোনটি চিত্রনাট্যের প্রয়োজন থেকে তৈরি—দর্শক সব জায়গায় তা বুঝতে পারেন না। ইতিহাস-নির্ভর ছবির ক্ষেত্রে এই জায়গাটিই সবচেয়ে সাবধানে সামলানো দরকার ছিল।

কিছু দৃশ্যে দক্ষিণী অ্যাকশন ছবির প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। ভারী সংলাপ, অতিনাটকীয় মুহূর্ত, নায়কোচিত উপস্থিতি—এসব সাধারণ দর্শককে আনন্দ দেবে ঠিকই, কিন্তু অনন্ত সিংহের মতো বাস্তব চরিত্রের জটিলতাকে আরও সংযতভাবে দেখালে ছবিটি হয়তো আরও গভীর হয়ে উঠত।

তবু সব মিলিয়ে ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি। নিখুঁত ইতিহাসের পাঠ নয়, আবার নিছক অ্যাকশন-এন্টারটেনমেন্টও নয়। বরং বিস্মৃত এক মানুষকে নতুন প্রজন্মের সামনে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

অশ্রুতে মিশে ছিল পাহাড়ের হাসি

শ্রাবণ রায়

কখনও কখনও একটি সোনা শুধু একটি সোনা নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা শৈশব, একটা পরিবার, একটা মাটির গন্ধ, অসংখ্য না-পাওয়া, অজস্র ত্যাগ আর ফিরে আসার এক অসম্ভব জেদ। গ্লাসগোর মঞ্চে যখন মীরাবাই চানুর গলায় উঠল সোনার পদক, তখন তাই শুধু একজন ভারোত্তোলক জিতলেন না—জিতে গেলেন মণিপুরের এক প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে উঠে আসা এক মেয়ে।

তারপর বাজতে শুরু করল 'জনগণমন'।

মীরাবাই দাঁড়িয়ে রইলেন মঞ্চে। সামনে তেরঙ্গা। চারপাশে আলো। আর দু'চোখ বেয়ে নেমে এল জল। সেই কান্না আনন্দের, কিন্তু শুধু আনন্দের নয়। নিজের জীবনের দিকে ফিরে

তাকালে হয়তো সেখানে দেখা যায় কত দীর্ঘ একটা পথ। কতবার শরীরকে হার মানাতে হয়েছে, কতবার মনকে বোঝাতে হয়েছে—আরও একবার, আরেকটু। মীরাবাই নিজেই বলেছেন, জাতীয় সঙ্গীত বাজতেই গত কয়েক বছরের সব লড়াই, সব যন্ত্রণা, সব ত্যাগ একসঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল।

মণিপুরের প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে আসা মেয়েটির কাছে ভারোত্তোলন কখনও সহজ ছিল না। কিন্তু একটা সময় সেই ছোট্ট শরীরটাই যেন হয়ে উঠল অসীম শক্তির প্রতীক। ২০১৪-তে কমনওয়েলথে রুপো, ২০১৮-তে সোনা, ২০২২-তে আবার সোনা। তারপর ২০২৬। গ্লাসগো। ৪৮ কেজি বিভাগ। তৃতীয়বারের মতো সোনা। ইতিহাস বলছে, কমনওয়েলথ গেমসে তিনটি সোনা জেতা প্রথম মহিলা ভারোত্তোলক তিনি।

কিন্তু এই সোনার সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশটি হয়তো ওজনের অঙ্কে নেই। আছে পতাকার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলার সেই মুহূর্তটায়।

টোকিওতে রুপো জেতার পর মীরাবাইয়ের জীবন বদলে গিয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন দেশের ঘরে ঘরে পরিচিত নাম। কিন্তু সাফল্যের পরের পথ কখনও মসৃণ হয় না। প্যারিসে ২০২৪-এ মাত্র এক কেজির জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করে চতুর্থ হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯ কেজি তুলেও মঞ্চে উঠতে পারেননি। সেই চতুর্থ স্থানটি হয়তো পদকহীন ছিল, কিন্তু মীরাবাইকে ভেঙে দিতে পারেনি। বরং আরও একবার গড়ে দিয়েছে।

চোট ছিল। ৫০ কেজি বিভাগ থেকে নেমে আসতে হয়েছিল ৪৮ কেজির ইভেন্টে। অর্থাৎ, আসল লড়াই ছিল নিজের ওজনের বিরুদ্ধে। বয়সও যে

আর পাশে নেই, সেটাও তিনি জানতেন। তবু ফিরে এসেছেন। নিজেকে আবার তৈরি করেছেন। আর গ্লাসগোতে ৪৮ কেজি বিভাগে মোট ১৯০ কেজি তুলে শুধু সোনা জেতেননি, স্ন্যাচে ৮৫ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৫ কেজি তুলে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ডও গড়েছেন।

একজন মানুষকে আমরা সাধারণত তাঁর পদক দিয়ে মাপি। মীরাবাইকে বোধহয় মাপা উচিত তাঁর ফিরে আসার ক্ষমতা দিয়ে। হারার পর আবার দাঁড়ানোর ক্ষমতা দিয়ে। ব্যর্থতার পর নিজের সঙ্গে আবার লড়াই করার সাহস দিয়ে।

গ্লাসগোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল, তখন হয়তো সেই জলের মধ্যে ছিল মণিপুরের পাহাড়, শৈশবের দিন, পরিবারের মুখ, কোচের পরিশ্রম, চোটের যন্ত্রণা, প্যারিসের হতাশা— আর ছিল এক অদম্য মেয়ের নিজের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

আজ সেই অশ্রু আসলে পরাজয়ের নয়। সেই অশ্রু বলে দিচ্ছিল, আমি ফিরেছি।

আর তাই মীরাবাই চানুর এই সোনা শুধু ভারতের পদকতালিকায় আর একটি সোনার সংখ্যা নয়। এটি এক পাহাড়ি মেয়ের জেদ, যন্ত্রণাকে জয় করার গল্প, আর বারবার প্রমাণ করে যাওয়ার গল্প—কিছু মানুষ হারলেও শেষ হয়ে যান না। তাঁরা আবার ওঠেন।

আর উঠে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে জানান— ‘আমি এখনও আছি।’

মহাকালের আঙিনায় থেকে যাবেন নেইমার

অজয় নন্দী

প্রায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হত তিনটি নাম। লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, নেইমার জুনিয়র। প্রথম দুজন বয়সে খানিকটা বড়। নেইমার তুলনায় সত্যিই জুনিয়র। তিনজনই দাঁড়িয়েছিলেন ফুটবল জীবনের শেষ প্রান্তে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ২০২৬ বিশ্বকাপই তাঁদের শেষ বিশ্বকাপ। মেসি বা রোনাল্ডো এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাননি। সেই জায়গায় নেইমার যেন একটু আগেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন। ব্রাজিলের হয়ে আর খেলবেন না। বয়সে তাঁদের চেয়ে ছোট হয়েও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর পথটা তিনিই আগে দেখালেন।

ব্রাজিলকে কখনই বিশ্বকাপ দিতে পারেননি। এমনকী সেমিফাইনালেও তুলতে

পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৌড় থেমে গেছে শেষ আটে গিয়ে, কখনও আবার শেষ ষোলোয়। কিন্তু টানা দেড় দশক ব্রাজিলের মতো দেশের ভরসার একনম্বর ঠিকানা হয়ে থাকাও কম কৃতিত্বের নয়। ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল করে তিনি দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। পেলের ৭৭ গোলের রেকর্ডও পেরিয়ে গিয়েছেন। চারটি বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ১০ নম্বর জার্সি পরেছেন—পেলের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্রাজিলীয়, যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ২০১৩ সালে কনফেডারেশনস কাপ জয় এবং ২০১৬-র রিও অলিম্পিকে ব্রাজিলকে প্রথম পুরুষ ফুটবল সোনা এনে দেওয়া তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

তবু নেইমারের ব্রাজিল-জীবনের সঙ্গে একটি আক্ষেপ চিরকাল জড়িয়ে থাকবে। তাঁর ট্রফি ক্যাবিনেটে বিশ্বকাপের মেডেল নেই। দলগত সাফল্য না হয় নেই, এমনকী সোনার বল বা সোনার বুটও নেই। কোনওবার এই দুই মহার্ঘ্য পুরস্কারের ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেননি। ২০১৪ সালে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই জার্মানির কাছে ব্রাজিল হেরেছিল ৭–১। ২০১৮ ও ২০২২—দু'বারই ব্রাজিল থেমেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ২০২২-এ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে গোল করেও শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। ২০২৬-এ শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে হারের মধ্য দিয়ে শেষ হল তাঁর বিশ্বকাপ–যাত্রা।

চোট যেন তাঁর কেরিয়ারের আর একটি সমান্তরাল গল্প। ২০১৪-র মেরুদণ্ডের

চোট থেকে শুরু করে ২০১৮, ২০২২ এবং পরবর্তী সময়ের একাধিক চোট তাঁকে বারবার মাঠের বাইরে রেখেছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, সম্পূর্ণ সুস্থ নেইমারকে আমরা যতটা দেখতে চেয়েছিলাম, ততটা দেখা হল না।
এটাই হয়তো তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

তবু নেইমারের গুরুত্ব শুধু পরিসংখ্যানে নয়। স্যান্টোস থেকে বার্সিলোনা, তারপর প্যারিস সাঁ জাঁ—যেখানেই খেলেছেন, তাঁর ফুটবলে ছিল নিজস্ব একটা ছাপ। ড্রিবলিং, স্কিল, গতি এবং সৃজনশীলতার মিশেলে তিনি এমন এক ধরনের ফুটবল খেলেছেন, যা একই সঙ্গে কার্যকর এবং উপভোগ্য। মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে বার্সেলোনার 'MSN' ত্রয়ীর অংশ হিসেবে তাঁর সময় আধুনিক ক্লাব ফুটবলের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়।

নেইমারকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। মাঠে তাঁর নাটকীয়তা, ডাইভ, চোট এবং শৃঙ্খলা নিয়ে নানা সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ খুব কমই ছিল। তিনি এমন একজন ফুটবলার, যাঁর পায়ে বল গেলে দর্শক অপেক্ষা করতেন—এ বার কী করেন! ফুটবলের পরিসংখ্যান সব কিছুর নির্ণায়ক নয়। কিছু ফুটবলার এমন আছেন, যাঁদের আমরা মনে রাখি আনন্দ দেওয়ার জন্য। নেইমার অবশ্যই সেই তালিকায় থাকবেন। ব্রাজিলের ১০ নম্বর জার্সিতে তাঁর অধ্যায় শেষ হয়েছে। বিশ্বকাপের ট্রফি না থাকলেও, ফুটবলকে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতাটুকু তাঁর কেরিয়ার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

অনেকেই তো সেমিফাইনালে তুলেছেন, ফাইনালে নিয়ে গেছেন, ট্রফিও জিতিয়েছেন। কিন্তু কালের নিয়মে হারিয়েও গেছেন। মহাকাল তাঁদের কীর্তিকে মনে রাখেনি। নেইমার অন্তত সেই তালিকায় থাকবেন না। নাইবা এল ট্রফি, নাইবা এল ব্যালন ডি'ওর। নাইবা এল সোনার বল বা বুট। সমকালের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি থেকে যাবেন। ঠিক যেমন থেকে গেছেন জিকো, সক্রেটিসের মতো কিংবদন্তিরা।

নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা কাফের গাঁও

উত্তম জানা

কালিম্পং শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয় কাফের গাঁও। অথচ সেখানে পৌঁছনোর পর মনে হয়, শহরটা যেন বহু দূরে কোথাও পড়ে আছে। মোবাইলের ব্যস্ততা, গাড়ির হর্ন, মানুষের তাড়া—সবকিছু একে একে পিছনে ফেলে পাহাড়ের কোলে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে সবুজের ঢেউ, চারদিকে পাহাড়, আর তার মাঝখানে ছোট্ট এক গ্রাম। কাফের গাঁও।

মাঝবয়সে এসে বুঝেছি, বেড়ানোরও বয়স হয়। একসময় ভ্রমণ মানেই ছিল যত বেশি জায়গা দেখা যায়। সকালে বেরিয়ে সারাদিন ছুটে বেড়ানো, একের পর এক দর্শনীয় স্থান, ছবি তোলা, ফিরে এসে আবার পরের দিনের পরিকল্পনা। এখন আর সেসব ভালো লাগে না। এখন বরং এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। যেখানে অলস

হয়ে বসে থাকা যায়। কিংবা কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাঁটা যায়। কাফের গাঁও ঠিক তেমনই।

জায়গাটার কথা কয়েক বছর আগেও শুনিনি। লাভার কথা জানতাম, লোলেগাঁওয়ের কথাও জানতাম। বেশ কয়েক বছর আগে লোলেগাঁও গিয়েওছি। কিন্তু তার কাছেই যে এমন একটা নির্জন গ্রাম রয়েছে, তা তখন শুনিনি। কিন্তু ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে পাহাড় আর অচেনা পাহাড় নেই। ফেসবুকে বেড়ানোর বিভিন্ন গ্রুপ যেমন আছে, তেমনই ইউটিউবেও নানা ভিডিও আপনার হাতের নাগালে। আপনি একটু ভ্রমণপিপাসু হলে, ভ্রমণের কয়েকটা ভিডিও দেখলে, এমন কত অজানা ঠিকানার হদিশ আপনার মোবাইল বেয়ে এসে যাবে!

কয়েক মাস আগে থেকেই একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা। সঙ্গে নিলাম অফিসেরই এক সহকর্মীকে। পাহাড়ি গ্রামে ঘোরার ব্যাপারে তারও আগ্রহ বেশ ভালই। ট্রেনে এনজেপি। সেখান থেকে শিলিগুড়ি জংশন হয়ে শেয়ারে লোলেগাঁও। বাকি পথটুকু নিয়ে গেল হোম স্টে থেকে পাঠানো গাড়ি। হোম স্টেও ছিল যথার্থ হোম স্টের মতোই। অর্থাৎ, ঝাঁ চকচকে বিলাশ বহুল ব্যাপার নয়। বরং, পাহাড়ি আন্তরিকতায় মোড়া। তাঁদের বাড়িতে, তাঁদেরই একজন হয়ে তিনটে দিন কাটিয়ে দেওয়া।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। শহরের অ্যালার্মের সঙ্গে এই ডাকের কোনও তুলনাই হয় না। জানলা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। দূরের পাহাড় তখনও মেঘের পাতলা চাদরে ঢাকা। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে মনে হল, এতদিন ধরে আমরা আসলে কীসের জন্য এত ছুটেছি? সেদিন কোনও পরিকল্পনা

করিনি। শুধু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।

পাহাড়ি গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। রাস্তা কখনও উঠছে, কখনও নেমে যাচ্ছে। দু'পাশে ঘাস, গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ি। কোথাও পাহাড়ের ঢালে চাষের জমি, কোথাও বাঁশঝাড়। মাঝেমধ্যে দু-একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা। তাদের মুখে তাড়াহুড়োর চিহ্ন নেই। মনে হয়, সময় এখানে অন্যভাবে চলে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখি, নীচে গভীর খাদ। তার ওপারে আরও পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে রোদ আর ছায়ার খেলা। একটু পরেই মেঘ এসে ঢেকে দিল সব। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঘ সরে গিয়ে খুলে গেল সবুজের বিশাল ক্যানভাস। প্রকৃতি যেন নিজের মতো করে ছবি আঁকছে, আবার মুছেও দিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম, এই পথের আসল সৌন্দর্য কোনও নির্দিষ্ট দৃশ্যে নয়। সৌন্দর্যটা লুকিয়ে আছে হাঁটার মধ্যেই। একা হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ কোনও পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ার মধ্যে। কিংবা কোনও কারণ ছাড়াই ভালো লেগে যাওয়ার মধ্যে।

বিকেলের দিকে পাহাড়ের আলো বদলে গেল। দূরের আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তখন গ্রামের এক নির্জন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। আশপাশে কেউ নেই। শুধু বাতাসে পাতার শব্দ। সেই মুহূর্তে মনে হল, জীবনে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না। একটু সময়, একটু নির্জনতা আর সামনে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতি—এই তো!

কাফের গাঁও থেকে ফিরে আসার সময় তাই মনটা অদ্ভুত ভারী হয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, জায়গাটা শুধু দেখে এলাম না; কিছু একটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো নিজের জন্য একটু সময়। হয়তো ভুলে যাওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর।

শহরে ফিরে আবার ব্যস্ততা শুরু হবে। ফোন বাজবে, কাজ জমবে, মানুষ তাড়া দেবে। তবু জানব, পাহাড়ের কোলে এমন একটি গ্রাম আছে, যেখানে একদিন আমি কোনও গন্তব্য ছাড়াই হেঁটেছিলাম।

আর সেই হাঁটায়, অনেকদিন পর, নিজেকেই যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলাম।

জটায়ু থাকলে নির্ঘাত লিখতেন, সারান্ডায় স্যারেন্ডার

কুন্তল আচার্য

সারান্ডা। নামটা শুনলেই মনে হয়, গা ছমছমে একটা ব্যাপার। জটায়ু থাকলে নির্ঘাত লিখে ফেলতেন, সারান্ডায় স্যারেন্ডার। ফেলুদা না এলেও মিতিন মাসি এসেছিলেন। উপন্যাসে যেমন আছে, রুপোলি পর্দাতেও তেমনই জমজমাট চেহারায় ধরা দিয়েছে সারান্ডার জঙ্গল।

সারান্ডা যাওয়ার কথা উঠলেই প্রথমে মনে হয়— বেশ দূর তো! কলকাতা থেকে জামশেদপুর, তারপর চাইবাসা। তারপর আরও পথ। ট্রেনের জানলার বাইরের পরিচিত দৃশ্য ধীরে ধীরে বদলে যায়। শহর ফুরোয়, জনপদ ফুরোয়, রাস্তার দু'পাশে গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর একসময় মনে হয়, শহরকে বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছি।

সারান্ডা মানে সাতশো পাহাড়ের দেশ। নামের মধ্যেই যেন তার পরিচয়। পাহাড়, অরণ্য, উপত্যকা—সব মিলিয়ে এক বিশাল সবুজ ভূখণ্ড। তারই মধ্যে কিরিবুরু। কিরিবুরু নামটির সঙ্গে নানা ব্যাখ্যা জড়িয়ে আছে। কিরি মানে নাকি পোকা, আর বুরু মানে পাহাড়। অর্থাৎ, পোকার পাহাড়। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনদিনের ভ্রমণে কোনও পোকার উৎপাত পাইনি, এটুকু বলতে পারি। অতেব, নির্ভয়েই যান। স্থানীয় মানুষের কাছে এই পাহাড়ের নিজস্ব এক পরিচয় রয়েছে। নামের অর্থ নিয়ে যত কথাই থাক, সেখানে গিয়ে প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ে, তা হল অরণ্য। শালগাছের সারি। মাঝে সেগুন। নাম না জানা আরও কত গাছ। কোন গাছ থেকে কোন পাখি ডেকে উঠছে, কে জানে! কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ, কোথাও হঠাৎ খোলা আকাশ। আর সেই হীরন্ময় নীরবতা।

শহরে আমরা নীরবতাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছি। এখানে নীরবতারও একটা শব্দ আছে। দূরে কোনও পাখি ডাকছে। হাওয়ায় পাতার শব্দ। কখনও ঝিঁঝিঁ। তারপর আবার সব চুপ। এই চুপ করে থাকার মধ্যেই সারান্ডার আসল সৌন্দর্য।

দু’তিন দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে। বিশেষ কিছু না করেও। সকালে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে পড়া। রাস্তা ধরে অলস পায়ে এগিয়ে যাওয়া। কোথাও বসে থাকা। দূরের পাহাড় দেখা। আবার ফিরে আসা। কোনও তাড়া নেই। কোথাও পৌঁছতে হবে না। এই ‘কোথাও পৌঁছতে না হওয়ার’ আনন্দটাই শহুরে মানুষের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিলাসিতা।

কিরিবুরুর কাছেই মেঘাতুবুরু। নামটাও যেন কবিতার মতো—মেঘের পাহাড়। সত্যিই সেখানে দাঁড়ালে মনে হয়, মেঘ যেন পাহাড়ের গায়ে এসে থেমেছে। কখনও এত নীচে নেমে আসে যে মনে হয়

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। মেঘ এখানে আকাশে শুধু ভেসে বেড়ায় না। যেন চরে বেড়ায়। সেই শক্তি চাটুজ্জে থেকে ধার করে বলতে হয়, এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে। সেই দৃশ্যের ছবি তোলা যায়। কিন্তু ছবিতে তার পুরোটা ধরা যায় না।

সারান্ডার আর একটি বিশেষত্ব—এখানে প্রকৃতি আর মানুষের জীবন পাশাপাশি হাঁটে। একদিকে গভীর অরণ্য, অন্যদিকে বহু পুরনো জনপদ। কিছুটা নেমে গেলেই, লৌহ আকরিকের খনি। ইস্পাত কারখানা। তার আওয়াজ অবশ্য কিরিবুরুতে আসে না। এখানে অনাবিল নিস্তব্ধতা, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি অনেক পিছনে চলে গেছে।

রাস্তার একদিকে ওড়িশা, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড। সীমানা কাগজে টানা। প্রকৃতির কাছে তার কোনও অর্থ নেই। কোন রাজ্যে কার সরকার, কোন রাজ্যে কে মুখ্যমন্ত্রী, এসব জানতে পাহাড় আর অরণ্যের বয়েই গেছে। পাহাড় একই, অরণ্য একই, বাতাসও একই।

এই অঞ্চলের সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বুদ্ধদেব গুহর লেখায় যে অরণ্য, যে নিঃসঙ্গতা, যে বুনো সৌন্দর্য বারবার ফিরে আসে, তার সঙ্গে সারান্ডার অনেক জায়গায় আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চাইবাসা হয়েই আসতে হয়। আর

এই চাইবাসাতেই নিয়মিত আনাগোনা ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়দের। মাঝে মাঝে তাঁরাও ঘুরে যেতেন এই অরণ্যে। তাঁদের লেখাতেও ঘুরেফিরে এসেছে এই সারান্ডার কথা। সিনেমার পর্দাতেও এই অরণ্য এসেছে নানা সময়ে। অরণ্য এখানে শুধু পটভূমি নয়, যেন নিজেই একটি চরিত্র।

যাওয়ার পথটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। সাধারণত বড়া জামদা বা বারবিলে নেমে সড়কপথে এগোতে হয়। তবে ট্রেনের উপর পুরো ভরসা করার আগে সময়সূচি দেখে নেওয়াই ভাল। বিশেষ করে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ইদানীং বেশ বিড়ম্বনায় ফেলছে। বিশেষ করে ফেরার সময় এই ট্রেনের সময়ের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। লেট বললে কম বলা হয়, মহালেট। হাওড়ায়

আশা না রাখাই ভাল। তবে কিরিবুরু হিলটপে একটা হোম স্টে আছে। সেখানেও ঠাঁই নিতে পারেন।

সারান্ডাকে দেখতে হলে একটু ধীরে যেতে হয়। দু'দিনের জন্য মোবাইলটা পাশে রেখে, সকালে দরজা খুলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, তারপর কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই হাঁটতে বেরিয়ে পড়তে হয়। একটু গেলেই সেলের প্রচুর কোয়ার্টার। একটা মিনি ভারতবর্ষ। সারান্ডা আসলে দেখার জায়গা নয়, অনুভব করার জায়গা।

পৌঁছোনোর কথা রাত নটায়। রাত বারোটার আগে ঢোকে না বললেই চলে। কখনও মাঝরাতও হয়ে যাচ্ছে। অতএব, সাবধান।

তবে সারান্ডার সৌন্দর্যের জন্য কিছুটা অনিশ্চয়তা মেনে নেওয়া যায়। নইলে, ফেরার পথে সরাসরি না ফিরে জামশেদপুরে নেমে গেলেন। সেখান থেকে অন্য ট্রেন ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে, সকালের দিকে লোকাল ধরে জামশেদপুর। সেখান থেকে অন্য ট্রেন।

থাকার জন্য ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে, আছে সেইল-এর গেস্ট হাউসও। আগেভাগে ব্যবস্থা করে গেলে সুবিধা। কারণ এখানে গিয়ে হঠাৎ শহরের মতো হোটেল খুঁজে পাওয়া যাবে—এমন

সন্ধে নামার সময় পাহাড়ের গায়ে আলো কমে আসে। অরণ্য আরও গাঢ় হয়। দূরে কোনও অচেনা পাখি ডাকে। হঠাৎ মনে হয়, এত দিন আমরা আসলে কোথায় ছুটছিলাম? তবে নির্ভয়ে হেঁটে বেড়াতে পারেন। বন্য জন্তুর আনাগোনা নেই। একসময় মাওবাদি আনাগোনা থাকলেও আপাতত তা অতীত।

স্নিগ্ধতায় মোড়া দু–তিনটে দিন। যার রেশ থেকে যাবে ফেরার পরেও। মনে হবে, সারান্ডার সেই রাস্তা, সেই শালবন, সেই মেঘাতুবুরুর মেঘ—সব কিছু বুঝি এখনও পিছনে পড়ে আছে।

বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২৬

bengaltimes.in

ISSN
2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন । সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।
ফোন ৯৮৩১২২৭২০১., ই মেল bengaltimes.in@gmail.com
ওয়েবসাইট: bengaltimes.in
সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী